dui bondhu – ??? ????

প্রায় বারো বছর হয়ে গেল, ভুতো আর রনির মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। ভুতো কেমন আছে , কোথায় আছে , বিয়ে-থা করেছে কিনা … কোন তথ্যই জানা নেই রনির। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ভুতোর কথা আর মনেই পরে না ওর। আজ অনেক বছর বাদে পুরণ স্কুলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই মনে পরল ভুতো কে। ছিপ ছিপে লম্বা, শ্যামলা গড়ন, বড়বড় ঝাঁকড়া ছুল- চোখ বন্ধ করলে এখনও স্পষ্ট ভাসে ছেলেটার চেহারা।

ভুতো মানেই দম ফাটা হাসি, বেঞ্চ বাজিয়ে হেঁড়ে গলায় গান, ক্লাসের ফাঁকে অবিকল এঁকে দেওয়া সোম নাথ সারের মুখ। লাস্ট বেঞ্চি ভবিতব্য ছিল তাদের দুই বন্ধুর। লেখাপড়ায় তো লবডঙ্কা। শুধুই গুলতানি আর শয়েতানি। সারদের মারধোরও কি কম খেয়েছে? কোনোক্রমে ফেল করতে করতে পাশ করে যাওয়ার পর অঙ্কের সার মৃদুল বাবু গার্জিয়ান কল অবধি করেছিলেন ওদের ।

রনির রাশভারী বাবা গম্ভিরমুখে শুনেছিলেন ছেলের গুনপনা। বকাবকির একশেষ হয়েছিল বাড়িতে । তবু তাদের বন্ধুত্য অটুট থেকেছে। ক্লাসের অন্য ছেলেরা বলত হরিহর আত্মা। ভুতোকে রনির বাড়িতে যতটাই অপছন্দ করতো, ভুতোর বাড়িতে ঠিক তার উলটটা । সেই কারনে, মনে মনে দারুন অপরাধ বোধ ছিল রনির। বাড়িতে না বলেই কতবার যে ওদের বাড়িতে গেছে রনি। ভুতোর মা, ভবানী কাকিমা রনিকে খুব ভালোবাসতেন। কতরকম রান্নাকরে খাওয়াতেন । ওর বাবা রেলে কাজ করতেন, বাইরে বাইরে পোস্টিং, মাসে একবার কি দুবার বাড়ি আসতেন। মা ছেলেরই সংসার। রনির শান্ত স্বভাবের জন্য কাকিমা ওকে ভরসা করতেন। প্রায়ই বলতেন, ভুতো ভয়ানক বাউন্দুলে, তুই ওকে এক্টু দেখে রাখিস তো বাবা।

মাধ্যমিকের রেজাল্টের দিন কাকিমা এসেছিলেন স্কুলে। সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছিল ভুতো। আর রনি ফার্স্টডিভিশন। ভুতো দারুন আনন্দ করেছিলো রনির মার্ক সীট দেখে। স্কুলের বাইরে ভজুদার দোকানে ওকে গরম গরম জিলিপিও খাইয়েছিল।

ভুতোর থেকে বেশী নম্বর পাওয়ায় রনিরই মন খারাপ লাগছহিল, কিন্তু ভুতো একবারও তা বুঝতে দেয়নি তাকে। কাকিমা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, অনেক বড় হোস বাবা। চোখটা যেন একটু ভিজে ছিল কাকিমার। তারপর আর খুব বেশী দেখা হওয়ার অবকাশ ছিলনা, রনির অনেক অনিছহা সত্তেও ওকে কলকাতার কলেজে ভরতি করে দিয়েছিলেন বাবা।

কলকাতায় বড়পিসির বাড়িতে থেকেই এগার বার ক্লাস্ পাশ করেছিল রনি। তখন সে পুরপুরি শহুরে। সাহিত্যেই ইন্টারেস্ট ছিল বরাবর। তাই বাংলায় অনার্স নিয়ে স্কটিশ কলেজে পড়ল সে।

কানাঘুষয় শুনেছিল ভুতো উচ্চমাধ্যমিক এর পর আর লেখাপড়া করেনি। কোথায় যেন ছোটখাটো চাকড়িতে ঢুকেছে। তারপরের দিনগুলো খুব দ্রুত কেটে গেছে।

বি এ পাশ করার পর প্রথম কয়েক বছর টিউশানি, স্কুলে পার্ট টাইম টিচার এর চাকড়ি আর অল্প সল্প লেখালেখি করার পর অবশেষে একটা পত্রিকায় এডিটরিয়াল বিভাগে চাকড়ি করছে রনি। মাইনে মন্দ নয়, আর সঙ্গে এক্সট্রা আধটু লেখার অভ্যেস তো রয়েইছে। পারিবারিক দিক দিয়েও অনেক পরিবর্তন এসেছে।

সোদপুরের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন রনির বাবা বেশ কিছু বছর আগে। সপরিবারে ওরা এখন কলকাতার ফ্ল্যাটে থাকে। রনির বড়দা ব্যাঙ্গালরে চাকড়ি করছেন একটি উচ্চমানের বহুজাগতিক সংস্থায়।

সামনেই বড়দার বিয়ে। কাকা জেঠা দের বিয়ের নেমন্তন্ন করতেই এসেছে রনি ও তার বাবা। শরিকি গণ্ডগোলে এই বাড়ির আত্মীয়দের সাথে খুব একটা সম্পর্ক নেই আর রনিদের। তবে বিয়ে থার ব্যাপারে না এলেও নয়। তাই আজ পিতাপুত্রের আগমন সোদপুরে। পুরনো স্কুলের সামনে এক দাদার বাড়ি ছিল।

সেখানেই বিয়ের কার্ড দিতে এসেছিলো রনি। ফেরার পথে একরাশ নস্টালজিয়া যেন ঘিরে ধরল ওকে। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে দু-এক জনের সঙ্গে ফেসবুক বা টুইটার এ যোগাযোগ আছে। তারা প্রত্যেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের মাধ্যমে বাকিদের কারো কারো কথাও জানতে পারে রনি।

কিন্তু ভুতো নামের মানুষটা যেন হারিয়েই গেছে রনির মন থেকে। এই ক'বছরে একবারও কেন ভুতোর কথা মনে হয়নি? একবার দেখা করলে কেমন হয়... হঠাৎ ঝোঁক চেপে গেল রনির। ভুতো দের বাড়ি টা ষ্টেশনের ওপারে, রেল কোয়ার্টারে। যদিও প্রায় বারো বছর হল ও বাড়িতে যায়নি রনি, তবু ঠিকানাটা এখনও স্মৃতিতে স্পষ্ট। হনহন করে হেঁটে মেন রোডে এসে অটো ধরল ও।

সাত আট মিনিটের রাস্তা। গল্প করতে করতে শীতের বিকেলে দু বন্ধু হেঁটেই চলে গেছে কতবার। ভুতোর পছন্দ ছিল খোসাওয়ালা চীনে বাদাম। এক ঠোঙ্গা কিনে কাড়াকাড়ি করে খেত দুজনে। পকেটে কতই বা পয়সা ছিল আর তখন। ভুতোর জন্য চীনে বাদাম কিনে নিয়ে গেলে কেমন হয়!!

নিজের ভাবনায় নিজেই হেসে ফেলল রনি। এখনকার ভুতো আদৌ চীনে বাদাম খায় কিনা কে জানে। অটো রেল কোয়ার্টারের সামনে নামিয়ে দিল রনিকে। বড়সড় লোহার গেট।

সবুজ ঘাসে ঢাকা রাস্তা চলে গিয়েছে ভেতরে। গেটের সামনেই একটা মিষ্টির দকান, এটা আগে ছিলনা। খুব বড় নয় দোকানটা, কাঁচের র‍্যাক গুলো সবই প্রায় খালি।

অল্প বয়সি একটি ছেলে মেঝেতে বসে রেকাবিতে কাজু বরফি কেটে কেটে তুলে রাখছে। রসগোল্লা গুলোই যেন একটু ফ্রেশ। পনেরোটা কিনল রনি। এখন ওদের বাড়িতে কত লোক আছে কে জানে। আছছা... ভুতোরা যদি আর না থাকে এখন এখানে। নিজের মধ্যেই একটু দমে গেল রনি।

নাহ। না ভেবে চিন্তে এতগুলো মিষ্টি কিনে ঠিক করেনি সে। যাকগে, দেখাই যাক না গিয়ে। নাহয় দেড়শ টাকা পুরনো বন্ধুর নামে নষ্টই হল। মিষ্টির বাক্সটা হাতে ঝুলিয়ে কোয়ার্টারের মধ্যে ঢুকল রনি। ভেতরটা প্রায় একি রকম আছে। ঘেঁষা ঘেঁষি করে দাড়িয়ে থাকা অনেকগুলো চারতলা বাড়ি, বহুদিন সংস্কার না হওয়া। মাঝখানে ছোট ছোট মাঠ, ঘাসে ঢাকা, দু পাশে বড়বড় গাছ। ভেতরটা শান্ত, চুপচাপ।

দুএকটা বাচ্চা ছুটোছুটি করছে মাঠে। ভুতোর বাড়িটা বি ব্লকে। এ টা পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরতে হবে, একটা জলের ট্যাঙ্ক আছে সামনে। ওই তো দেখা যাচ্ছে বাড়িটা। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ির তলায় ঢুকল রনি।

বাঁ দিকে এক সার দেওয়া লেটারবক্স। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান বাঁ দু দিকেই দুটো ফ্ল্যাট। দরজা বন্ধ। আর একটা তলা। বাঁ দিকের ফ্ল্যাট টাই ওদের। দরজায় তালা নেই। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কলিংবেল টিপল রনি। যা থাকে কপালে।

(২)

দু-বার কলিং বেল টেপার পর ছিটকিনি খোলার শব্দ হল। দরজার পাল্লার ফাঁকে যে মুখটি উঁকি দিল, সে ভুতো কিংবা কাকিমা নয়, একটি বছর পঁচিশেকের মেয়ে।, ছোটোখাটো চেহারা, রোগা, পান পাতার মত মুখ। আধ ময়লা নাইটি পরনে। জিজ্ঞাসু চোখে রনির দিকে তাকাল সে। ভুতোর ভাল নামটা যেন কি?

ধুস, মনেই পড়লনা। খানিক ইতস্তত করে রনি জিজ্ঞেস করল, ভুতো আছে? দু-তিন সেকেন্ড মেয়েটি তাকিয়ে রইল ওর দিকে। রনি খেয়াল করল, রোগা, কালো কোল চেহারাটা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, চোখ দুটো বেশ অন্যরকম, টলটলে, কালো, গভীর। মনে হয়, এ মেয়ের মনের মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। দরজা ছেড়ে সরে দাড়াল মেয়েটি, মৃদু গলায় বলল, ভেতরে আসুন। জুতো ছেড়ে ভেতরে ঢুকল রনি।

বাইরের ঘরটা প্রায় একি রকম রয়েছে। একটা ডাইনিং টেবিল, তিনটে চেয়ার, বড়সড় একটা সোফা, যার কভারটা বেশ পুরনো এবং আকাচা। ঢুকেই ডানদিকে যে বেডরুম টা ছিল, তার দরজায় ভারী পরদা ঝুলছে, এটাই যা নতুন। ওই ঘরটাই ছিল ভুতোর। খাটের উপর আধশোয়া হয়ে কাকিমার হাতে বানানো ডাল বড়া খেতে খেতে কত আড্ডা মেরেছে তারা। বাইরে ডাইনিং টেবিলের পাশে একটা ছোট টুলে সেলাই এর মেশিন চালাতেন কাকিমা, ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় আওয়াজ হত থেকে থেকে। সোফাটা ছিল কি? পাশের বেডরুম টার দরজার পরদা গোটান। সিলিং ফ্যান চলার আওয়াজ আসছে। মানে কেউ আছে। মেয়েটি রনিকে সোফায় বসতে বলে সেই ঘরেই গেল।

ভেতর থেকে ক্ষীণ পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল, কে এসেছে? মেয়েটির গলা, তোমায় খুঁজছে একজন, আগে দেখিনি। -কি দরকার জিজ্ঞেস করে এস, পুরুষ কণ্ঠ টি তিক্ত। এটা কি ভুতোর গলা? আবার মেয়েটির মুখ দরজায়, কি দরকার ওর সাথে? প্রশ্নের মধ্যে যেন নিহিত আছে, কি বা দরকার আর থাকতে পারে ওর সাথে। রনি বেশ বিব্রত বোধ করল। কেন যে ঝোঁকের মাথায় আসতে গেল এখানে? অস্বস্তি গোপন করে ও বেশ জোরেই বলল, দরকার কিছু নেই, আমি ওর স্কুলের বন্ধু রনি। এমনিই দেখা করতে এসেছিলাম।

মেয়েটি চোখ নামিয়ে আবার ঢুকে গেল ঘরে। এরপর আর কোন কথা শোনা গেলনা ভেতরে। খানিক্ষন পরে একটা ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ এল ঘর থেকে, চাকা গড়িয়ে নিয়ে চলার মত। আওয়াজটা ক্রমশ স্পষ্ট হল।

দু মিনিট পরে ঘরের দরজায় যে মুখটি দেখা গেল, অনেক চেষ্টা করেও নিজের ছেলেবেলার বন্ধুটির সাথে তার কোন মিল পেলনা রনি। মধ্য তিরিশের একটি লোক, ঢ্যাঙ্গা মতন রোগা, ক্ষয়াতে চেহারা।

মাথায় পাতলা হয়ে আসা চুল, কানের দু পাশে রুপোলী আভা, আ কামানো কাঁচা-পাকা দাড়ি, গর্তে বসা চোখদুটোর তলায় গভীর কালো ছোপ। সবুজ চেক চেক লুঙ্গির উপরে ছাই রঙের ফতুয়া। হাড় গিল গিলে হাত দুটো দিয়ে ধরা আছে ওয়াকার। পিছনে মেয়েটি, কাঁধের উপর হাত রেখেছে ক্ষীণজীবী মানুষটির।

একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। অস্থির হয়ে উঠল রনি। এ কিছুতেই ভুতো হতে পারেনা। অসম্ভব। জোর করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল রনি। এখুনি এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কে যেন ওর পা দুটো মেঝের সাথে আটকে রেখেছে। নিশ্চল, নির্বাক শরীরটা নিয়ে পুতুলের মত বসে রইল রনি।

আধবুড়ো লোকটা দু-তিন সেকেন্ড অপলক চেয়ে রইল রনির দিকে। ঠোঁটের কোনে ভেসে উঠল এক অমলিন হাসি। রনি দেখতে পেল, সামনের পাটীর গজ দাঁতটা।

-'উঃ, হাসলে যেন ঠিক উত্তম কুমার'- মনে পড়ল ড্রিল সার অর্জুন মল্লিকের কথাটা। খুব পেছনে লাগার অভ্যেস ছিল সারের। ক্ষিপ্র শরীর ছিল ভুতোর, ড্রিলে তুখোড়। সার প্রায়ই পরামর্শ দিতেন ওকে সিনেমায় নামার জন্য। আজ যদি সার দেখতেন ভুতোকে... ওয়াকার ঠেলে ঠেলে সামনে এল ভুতো। মেয়েটি ওকে সাহায্য করল চেয়ারে বসতে।

হাসিটা ভাগ্যিস মিলিয়ে যায়নি ওর মুখ থেকে। কিছুক্ষণ আগের অস্বস্তি টা আর নেই রনির। তার বদলে শুধু বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে একটা কান্না। বড্ড অসহায় লাগছে নিজেকে। ভুতো বসার পরে ডান হাত টা বাড়িয়ে দিল রনির দিকে। শুকনো দুর্বল হাত টা স্পর্শ করল রনি।

সেই উষ্ণতা টা নেই, তবে আন্তরিকতা এখনো অনুভব করা যায়। নিজের হাতে রনির হাত টা শক্ত করে মুঠো করল ভুতো। চোখ বন্ধ হল, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল এক ফোঁটা জল। সেই জল প্রতিফলিত হল রনিরও চোখে। কষ্ট করে চেপে রাখা কান্নাটা মুহূর্তেই উগড়ে এল ভেতর থেকে, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল রনি। ভুতো আরও শক্ত করে চেপে রইল ওর হাত।

আবছা চোখে রনি দেখল, চোখ মুছছে মেয়েটিও। নিজেকে সামলে নিয়ে সোফায় সোজা হয়ে বসলো ভুতো। – বারো বছর... না রে? ভুতো তাকিয়ে আছে রনির দিকে, একই রকম রয়েছিস তুই। কোন চেঞ্জ নেই, বলে একটু হাসল ভুতো। রনিও।

-তোর কি হয়েছে ভুতো? এমন হল কিকরে? রনির গলা বুজে এল আবার। চেয়ারে মাথা হেলিয়ে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ভুতো। -সবই নিয়তি। অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। ধর্মতলার মোড়ে একটা মিনিবাস ধাক্কা মারল। ছিটকে পড়লাম ফুটপাতে। তারপর জ্ঞান ফিরল সরকারী হাসপাতালে।

মালাইচাকি ভেঙ্গে গেছে। অপারেশন করতে অনেক টাকা লাগবে। আমার সে সংস্থান নেই। তাই এইভাবেই চলছে গত সাত মাস। এখন ওয়াকার টা নিয়ে একটু এঘর ওঘর করতে পারি এই অবধি, একটু থামল ভুতো। চাকরী টা চলে গেল মাঝখান থেকে। মার্কেটিং এর কাজ ছিল। আমাকে দিয়ে এখন আর কি বা হবে বল। রনি চুপ করে শুনছিল ভুতোর কথা।

ছাড় তো ওসব। আমার দুঃখের বারমাস্যা শুনিয়ে তোকে বোর করতে চাইনা। কতদিন পর তুই এলি রনি। আমার যে কি ভাল লাগছে আজ... তোর খবর বল। লেখালেখি তো করছিস ভালই। প্রতিদিনে পড়েছিলাম তোর একটা আর্টিকেল বেশ কিছুদিন আগে। ভীষণ অবাক হল রনি।

-তুই... তুই এত কিছু জানিস? -কিছু কিছু ঘটনা জানি। যেমন তোরা সোদপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছিস। তুই তো অনেক আগেই ছেড়েছিলি এ জায়গা। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড অপরাধ বোধে দগ্ধ হচ্ছিল রনি। সে তো কিছুই জানতোনা ভুতোর ব্যাপারে। -আমি তো বরাবরি তোর লেখার ফ্যান, জানিস। এখনও একিরকম ভালবাসি, হাসল ভুতো। রনি ওর কাজ সম্পর্কে জানাল। আবার উচ্ছসিত ভুতো। বাঃ বাঃ, খুব ভাল কাজ করছিস রনি। ভেরি গুড।

কথার ফাঁকেই চা ও মিষ্টি নিয়ে এসেছে মেয়েটি। কখন যেন ঘরে গিয়ে পালটে এসেছে পোশাক। সালয়ার কামিজ, ছাপোষা ধরনের। ভুতো বলল, আলাপ করাইনি। আমার বউ, আঁখি। আর এ হল আমার স্কুল জীবনের সবথেকে ভাল বন্ধু, রনি। এখন বড় লেখক হয়ে গেছে। আঁখির চোখে সম্ভ্রম। হাত জোড় করে নমস্কার করল ও। অনেক বড় চুল আঁখির, লম্বা বিনুনি ছাড়িয়েছে কোমর। প্রতি নমস্কার এর পর ভুতো বলল, মা থাকতে থাকতেই বিয়ে দিয়েছিল। -থাকতে থাকতে মানে? কাকিমা ... মাথা নিচু করল ভুতো। দু বছর হল, মা চলে গেছে। কিডনি ফেইল। বাবা তো স্কুল পাশ করার পরেই। হঠাৎ স্ট্রোক। আমরা এখান থেকে

যেতে যেতেই সব শেষ।

ব্যাঙ্ক থেকে বাবার পি এফ, গ্র্যাচুইটি র টাকা পয়সা তুলে সংসারে খানিকটা সচ্ছলতা যত দিনে এল, আমার পড়াশুনার ইতি হয়ে গেছে। এমনিতেই ভাল ছাত্র তো কোনকালেই ছিলাম না জানিস, তবু গ্র্যাজুয়েট টা হওয়ার চেষ্টা করতাম। ব্যাস, সব ছেড়ে ছুড়ে অনেক কষ্টে একটা অ্যা কোয়া গার্ড এর অফিসে চাকরি জোটালাম।

সামান্য মাইনে, প্রচুর পরিশ্রম। তবু লেগে ছিলাম কষ্ট করে। তারপর এই মার্কেটিং এর কাজ টা পাই চার বছর আগে। তারপর মোটামুটি ঠিকঠাক চলছিল সংসারটা। মায়ের ইচ্ছেয় বিয়েও করলাম। আমাদের অফিসেরি এক সাব স্টাফের মেয়ে আঁখি। পারিবারিক অবস্থা আমাদেরি মত। তবে মেয়েটা খুব ভাল। একবার কথা বলেই ভাল লেগে গেছিল। মাও খুব ভালবাসত ওকে।

কিন্তু বিধি বড় বাম। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই মায়ের শরীর খারাপ হল। দুটো কিডনিই কাজ করছেনা। জলের মত পয়সা খরচা হয়েগেছে তখন। অনেক চেষ্টা করেছিলাম মাকে বাঁচানর, কিন্তু পারলাম না। খুব হেল্পলেস লাগত মায়ের মৃত্যুর পর। যাইহোক, মোটামুটি সামলে নিচ্ছিলাম। সেদিন আঁখির জন্মদিন ছিল, ওর খুব পছন্দ বাদশার চিকেন রোল, সেটা কিনবো বলেই ধর্মতলা এসেছিলাম, তারপর কি যে হয়ে গেল... নীরব হল ভুতো। চাপা কান্নার শব্দ পেল রনি। কাঁদছে আঁখি। রান্নাঘরের দরজার আড়ালে। স্বামীর এই পরিনতির জন্য নিজেকেই নিশ্চয় দোষারোপ করে বেচারি। এত দুর্ভাগ্যও আসে মানুষের জীবনে? কতখানি যন্ত্রণা আর সংগ্রাম কে সঙ্গী করে প্রত্যেকটা মুহূর্ত অতিবাহিত করছে এরা। সহায় সম্বল হীন দুটো মানুষ। -ওকে বলি, চলে যাও তুমি, ফিসফিসিয়ে বলল ভুতো। কিই বা বয়েস ওর, আমার মত একটা অথর্বের জীবনে দুঃখের বোঝা বইবে কেন শুধু শুধু? কিন্তু ও যায়না। এই রুপ গুন হীন মানুষটাকেই ভালবেসে বসে আছে, হাসল ভুতো। কি মানবিক সেই হাসি। কোথাও এতোটুকু সুখ লুকিয়ে আছে সেই হাসির গভীরে।

রনি, অভাব কি বস্তু কখনো উপলব্ধি করেনি। 'জীবন সংগ্রাম' শুধুই তার কাছে গল্পে, উপন্নাসে পড়া একটা ভারী-ভারতিক শব্দ মাত্র। আজ খুব কাছ থেকে সেই শব্দটার অর্থ অক্ষরে অক্ষরে অনুধাবন করল সে। চলে আসার সময় কিছু টাকা সে ধার দিতে চেয়েছিল ভুতোকে। কিন্তু ওরা নেয়নি।

– আমি কি কিছুই করতে পারিনা তোর এই অবস্থায়? আকুতি করেছিল রনি। ভুতো ওর হাত দুটো ধরে বলেছিল, বন্ধুত্যে চ্যারিটির কোন জায়গা নেই রে রনি। এটা আমি নিতে পারবোনা, কিছু মনে করিস না তুই। তবে যদি সত্যি আমার জন্য কিছু করতে চাস, তাহলে আমাদের নিয়ে একটা গল্প লিখিস।

আমাদের মত সর্ব অর্থে ব্যর্থ মানুষ, যাদের নিয়ে কোন গল্প হয়না, তোর সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই তারা অমর হয়ে থাকবে, পৌঁছে যাবে আর পাঁচটা মানুষের কাছে। এটাই হবে আমার বন্ধুর থেকে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

ভুতোর বাড়িতে কাটান কয়েকটা ঘণ্টা রনির জীবনে কয়েকটা বছরের অভিজ্ঞতার সমান। এক অন্যরকমের অনুভূতি নিয়ে ফিরে এসেছিল সে।

শিক্ষায় ও সামাজিক অবস্থানে ভুতো্র থেকে সে এগিয়ে থাকলেও মানুষ হিসেবে ভুতো তার থেকে অনেক বড় হয়ে উঠেছে আজ। পুরনো বন্ধুটিকে সেই একইরকম করে খুঁজে না পেলেও, তার পরিবর্তে দুটি খাঁটি মানুষ কে প্রত্যক্ষ করেছে আজ রনি। দেখা যাক, বন্ধুর শেষ ইচ্ছেটা পূর্ণ করতে পারে কিনা সে।